বাঙালির বৈশাখ: একাল সেকাল

মাসুম আওয়াল

তুলো ওড়ে ধুলো ওড়ে, ফুরফুরে চুলও ওড়ে,
উড়ে যায় কাক
পাতা ওড়ে খাতা ওড়ে, দাদুটার ছাতা ওড়ে,
মৌমাছি উড়ে উড়ে, যায় মৌচাক।
গরীবের ঘর ওড়ে, মুরগীর পর ওড়ে, চারিদিকে
পড়ে যায়, কি যে রাখ ঢাক,
সব এলো মেলো করে, এলো বৈশাখ।

এভাবেই উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয় নববর্ষ। যুগ যুগ ধরে বাঙালিরা নববর্ষ উৎসব পালন করে আসছে। রঙে ঢঙে বদলেছে এই উৎসবের আঙ্গিক। অনেকেরই হয়তো অজানা বাংলা নববর্ষের কয়েক দশক আগের রূপরেখা। আমরা আলোচনা করবো নববর্ষেও অতীত-বর্তমান নিয়ে।

নববর্ষের অর্থ

নববর্ষ মানেই পুরানো বঙ্গাব্দের শেষ হয়ে নতুন বঙ্গাব্দের সূচনা। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে বসন্ত ঋতুর বিদায়ের পর বৈশাখের আগমন। বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিকে আমরা পহেলা বা পয়লা বৈশাখ বলি। 'পহেলা' শব্দটি উর্দু। যার আভিধানিক অর্থ 'প্রথম'। আর বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস হলো বৈশাখ তাই আমরা এই নববর্ষ উৎসবকে 'পহেলা/পয়লা বৈশাখ' ও বলি। এই নববর্ষ ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে ১৪/১৫-ই এপ্রিল পালিত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ ও আসামের বরাক ভ্যালির বাঙালিরাও এই উৎসবটি পালন করে থাকে বলে এটা বাঙালি জাতির সর্বজনীন লোকউৎসব বলেও বিবেচিত হয়। তবে আসামে এই নববর্ষ উৎসব 'বিহু' নামে পরিচিত। গ্রেগোরিয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে বাংলাদেশে নববর্ষ পালন করা হয় ১৪ই এপ্রিল।

কেমন করে এলো নববর্ষের উৎসব?

বাংলা নববর্ষ ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে জমিদারের খাজনা আদায় থেকে বর্তমানে দোকানের হালখাতা সব ক্ষেত্রেই কিন্তু অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশই হচ্ছে এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর শশাঙ্কের বর্ষপঞ্জি অনুসরণ না করে মুসলিমদের হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই প্রজাদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরী পঞ্জিকা চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় হিজরী বছর ৩৫৪.৩৬ দিনে পূর্ণ হয়। ফলে সৌরপঞ্জির সাথে এর ১১ দিনের পার্থক্যের কারণে ঋতু ও কৃষি ফলনের সাথে এর মিল থাকত না, ফলে কৃষকরা অসময়ে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য হতো। সম্রাট আকবর প্রথম খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে দিয়ে প্রাচীন বর্ষপঞ্জির সংস্কার করে নতুনভাবে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। ফতুল্লাহ শিরাজী মূলত সৌর সন ও আরবি সনের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম তৈরি করেন। বাংলা সাল গণনা শুরু হয় ৯৯৩ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ থেকে। তবে এই গণনাপদ্ধতি কার্যকর করা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহনের বছর ৯৬৩ হিজরী বা ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে। সে সময় ৯৬৩ চন্দ্র সনকে ৯৬৩ বাংলা সৌর সনে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলা বর্ষপঞ্জির নতুন যাত্রা সূচনা করা হয়। অর্থাৎ বলা যায় বাংলা বছর গণনা ১ থেকে শুরু হয়নি শুরু হয়েছিল ৯৬৩ থেকে আর সেই হিসাবে বাংলা বর্ষপঞ্জির বয়স এখন মাত্র ৪৬৫ বছর।

প্রথমে এই সনের নাম ছিল 'ফসলি সন' পরবর্তীকালে তা বঙ্গাব্দ বা বাংলাবর্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর

বাংলা সন প্রবর্তনের ভিত্তি ছিল হিন্দু সৌর পঞ্জিকা যে পঞ্জিকার নাম ছিল শক বর্ষপঞ্জি বা শকাব্দ, সে পঞ্জিকা অনুসারে বাংলার ১২ মাস আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস ছিল চৈত্র মাস, কিন্তু ৯৬৩ হিজরিতে ফতুল্লাহ শিরাজীর বর্ষপঞ্জি সংস্করণের সময় চন্দ্র সনের প্রথম মাস মুহররম ছিল বাংলার বৈশাখ মাসে, তাই তখন থেকেই বৈশাখকে বাংলা বছরের প্রথম মাস হিসাবে গণনা করা শুরু হয়।

নববর্ষ ও সম্রাট আকবর

ইতিহাস বলছে মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকেই বাংলায় নববর্ষ উৎসবের শুরু। তবে সে সময় এটি ছিল প্রধানত খাজনা আদায় উৎসব। নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলা বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১ তারিখে কিছু উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, যা রাজকর আদায়ের উৎসবও বলা যায়। তখন প্রজারা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে ফেলে আসা বছরের বকেয়া খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতেন এবং জমিদারের কাছারি থেকে নতুন বছরের বন্দোবস্ত গ্রহণ করতেন। ভূস্বামী ও জমিদারেরা এই দিনটিতে প্রজাদের নিয়ে পুণ্যাহ করতেন। সেই আমলে রাজপুণ্যাহ আর নববর্ষ ছিল সমার্থক। তাই জমিদারগণ পরের দিন মানে ১লা বৈশাখ প্রজাদের মিষ্টি মুখ করানোর সাথে সাথে গান-বাজনা, যাত্রা, মেলা প্রভৃতি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রকৃতপক্ষে তাদের অর্থশোক ভোলানোর চেষ্টা করতেন।

খাজনা আদায়ের উৎসব থেকে হালখাতা

কিন্তু ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপ হলে বন্ধ হয়ে যায় পয়লা বৈশাখের এই খাজনা আদায়ের উৎসব। তবে এই দিনে আনন্দ ভাগাভাগি করার বিষয়টি থেকেই যায়। বর্তমানে হালখাতা হিসেবে আজও বাঙালির জীবনে অমলিন হয়েই রয়ে গেছে পহেলা বৈশাখ। পরবর্তীকালে পহেলা বৈশাখ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে মিশে আরও আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে উঠেছে। বাংলা নববর্ষ প্রতিটি বাঙালির জীবনে কল্যাণ ও নবজীবনের প্রতীক হয়ে বছরের একটি অন্যতম শুভদিন হিসেবেও পালিত হচ্ছে।

সেকালের নববর্ষ

আগেকার দিনে নববর্ষের আমেজ এখন নেই বললেই চলে। সারা মাস ধরে চলতো বৈশাখী মেলা। কদমা, বাতাসা, খই, মুড়কি, নাড়ু ইত্যাদি বিক্রি হতো বৈশাখী মেলায়। বিক্রি হতো হাতপাখা, খেলনা হাতি, খেলনা ঘোড়া, একতারা, ডুগডুগি, ঢোল ইত্যাদি। উৎসবমুখর আমেজ ছিল মেলাতে। বিনোদনের জন্য মেলায় বৌ-নাচুনি, পুতুল নাচ, চরকা ঘুরানোসহ নানাবিধ আয়োজন থাকতো। এই দিন মানুষ নতুন কাপড় পরতো, আনন্দ উল্লাসে সময় কাটাতো এবং প্রার্থনা করতো সারা বছর যেন এমনই আনন্দঘন থাকে।

পাকিস্তান আমলেও বাঙালির নববর্ষের আয়োজন প্রধানত ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। গ্রাম থেকে ক্রমেই শহরমুখি হয় নববর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব। সে সময় শহরে এর প্রসার বিস্তারে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও ঘৃণা। ফলে শহরে পহেলা বৈশাখ শুধু পারিবারিকভাবে পালিত হতো।

একালের নববর্ষ

নববর্ষের উৎসব আয়োজনে রমনার বটমূলে ছায়ানট আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠান যুক্ত হয় ষাটের দশকে। সামাজিকভাবে পহেলা বৈশাখ পালন জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ছায়ানটের ভূমিকা অনেক। এরপর আশির দশকে সংযোজন হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার। ১৯৮৭ সালে যশোরে পৌর পার্কে উদীচীর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থেকে শুরু হয়েছে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। যশোরের সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে পৌর পার্ক থেকে বের হয় এক আনন্দ মিছিল। নাম 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। ঢোল, খোর-করতালের মুখরিত হয়ে সমাজের সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সেদিনের মঙ্গল শোভাযাত্রা পেয়েছিল সর্বজনীন মর্যাদা। এই মঙ্গল শোভাযাত্রা অচিরেই দেশের সব মানুষের নজর কাড়ে। ১৯৮৯ সাল থেকে ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউট যশোরের আদলে আয়োজন করে আসছে বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আনন্দ শোভাযাত্রা প্রকারান্তরে মঙ্গল শোভাযাত্রা। এখন আর পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ উৎসব গ্রামভিত্তিক নেই। রাজধানীসহ সকল বিভাগ জেলায় থানায় গ্রামে-গঞ্জে বিপুল সমারোহে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানমালার আয়োজন হয়। অফিস-বাসা সবখানেই বাঙালি পালন করে নববর্ষের উৎসব।

১৪২৯ পেরিয়ে ১৪৩০

১৪২৯ পেরিয়ে এলো ১৪৩০। সূচনা হলো আরও একটা নতুন বঙ্গাব্দের, শুরু হলো নবরূপে নববর্ষের পথচলা। অনেক বছর ধরে শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময়, বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা, বৈশাখী মেলা, হালখাতা ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা বরণ করে আসছে নববর্ষকে। পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ প্রতিটি বাঙালির জীবনে সংস্কৃতিসমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন যা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই দিনটিতে বাঙালি পুরুষরা পাঞ্জাবি এবং নারীরা শাড়িতে নিজেদের সাজিয়ে তোলে। এছাড়াও এই দিনটি সংস্কৃতি চর্চারও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ এই নববর্ষের উৎসব ঘিরে বাঙালিরা নানারকম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে নতুন বছরকে আপন করে নেয়। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ। সকলের এই প্রত্যাশা ১৪৩০ হয়ে উঠুক মানুষের কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও মঙ্গলের।

নববর্ষের ছুটি

বাংলার মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত রচনা করেছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। জনমানুষকে বাংলার শেকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়েছেন তিনি। পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব নতুন করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন ফজলুল হক। গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের ভাষা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন শহুরে মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক উৎসবের ছোঁয়া কীভাবে এনে দিতে পারে নতুনের লড়াইয়ের শক্তি। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ উৎখাত হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন। এটি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট ধারণা উপলব্ধি করার ঐতিহাসিক এক ঘোষণা। সে বছর বাঙালি তার নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে।